ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে শিক্ষকতা পর্ব -১

১৪/১/১৯৯২ তারিখে যেদিন প্যাথলজির প্রভাষক হিসাবে যোগদান করলাম সেদিন বিভাগীয় প্রধান ছিলেন এসোসিয়েট প্রফেসর ফজলুর রহমান স্যার। পরের দিন বিভাগীয় প্রধান হিসাবে যোগদান করেন প্রফেসর শাহ মুনির হোসেন স্যার। বৃটেনের জিএমসি কর্তৃক ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ রিকগ্নিশিন পাওয়ার জন্য একটি পরিদর্শক টিম আসার কথা ছিল। তাই কলেজের শুন্য পদগুলি পুরন করার জন্য অনেক টিচার সেদিন যোগদান করেছিলেন। শাহ মনির স্যার ইতিপুর্বে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে ছিলেন। তাই যোগদান করার পর ময়মনসিংহে শিফট হবার প্রস্তুতির জন্য অল্প কিছু দিন ঢাকায় ছিলেন। ততদিন ফজলুর রহমান স্যার আমাদের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। স্যার আমাদের বলছেন "আপনাদেরকে আগেই ক্লাস দিচ্ছিনা। কিছুদিন পড়াশুনা করে প্রস্তুত হয়ে নিন। " আরামে দিন কাটতে লাগল। কাজ নাই, প্রাক্টিস নাই। জীবনের আরামতম দিনগুলি ছিল ক্লাস ও ল্যাবরেটরি ওয়ার্ক শুরু করার আগ পর্যন্ত। যোগদান করার কয়েকদিন পর এপ্রোন্টা গায়ে দিয়ে একটু এম-২৪ ব্যাচের ভাইবা প্রাক্টিক্যাল রুমে ঢুকলাম। আমার ডিউটি ছিল না। এমনি ঢুকলাম। সাথে সাথে এক সুদানী ছাত্র আমাকে বলল "Sir, is it haematocrite tube? (এটা কি হেমাটোক্রিট টিউব)" আমি বললাম "Yes(হ্যা)। " আমি ১৯৮৪ সনে প্যাথলজি ভাইভা দিয়েছি, প্রায় ৮ বছর হল। আমার এটি এতদিন চেনার কথা না। ছাত্র যখন বলছে হেমাটোক্রিট টিউব তাহলে তাই হবে।
আমি ভাইবা বোর্ডের পাশে একটি চেয়ার নিয়ে বসলাম। ঐ ছাত্রের হাতে স্যার ঐ রকম একটা টিউব দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন "হোয়াট ইজ দিস?" ছাত্র বলল "হেমাটোক্রিট টিউব।" আসলে ওটা ছিল হিমোগ্লোবিন পিপেট। আমিও ভুল বলেছিলাম। স্যার ক্ষেপে গিয়ে বললেন "তুমি এইটাই চেন না, পাস করবে কেমনে? " ছাত্রটি নিরুপায় হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল আর মনে মনে বলল "এই নতুন টিচারই তো আমাকে ভুল বলে দিয়েছে! " আমিও মনে মনে বললাম "এই ছাত্র কেন একটা অপরিচিত টিচারের কাছে জানতে চাইল? শুধু এপ্রোন গায়ে থাকলেই সব কিছু জানা যায় না। " লজ্জা পেয়ে ছেলেটার সামনে থেকে চলে গেলাম। ঐ ছেলেটি মিডল ইস্টের একটি দেশের বাদশার ছেলে, সবাই তাকে প্রিন্স নামে জানত। ময়মনসিংহ শহরে বিয়ে করেছে, তার মতো বাচ্চা হয়েছে। অনেক দিন এম বি বি এস কোর্সে ছিল। কত বছর লেগেছে পাস করতে তা জানি না।

সিনিয়র লেকচারার ডাঃ আনিস ভাই একদিন আমাকে বললেন
-ডাঃ সাদেক সাব, আমি আগামীকাল ছুটি নেব।আপনি আমার ক্লাসটা নিয়ে নিবেন। কলয়েড গয়টার পড়াতে হবে।
-আমার তো প্রস্তুতি নেই।
-তা হলে ক্লাসে ঢুকে ছাত্রদের পারসেন্টেজ দিয়ে ছেড়ে দিয়েন। ছাত্ররা খুশী হয়ে চলে যাবে।
-আচ্ছা, ঠিক আছে।

রাতে চিন্তা করলাম "জীবনে প্রথম মেডিকেলে ক্লাস নিব। না পড়ায়েই ছেড়ে দেব! না তা হবে না। পুরা এক ঘন্টাই পড়াব।
গভীর রাত পর্যন্ত কলয়েড গয়টার পড়লাম।
সুন্দর ক্লাস নিলাম। পড়ানোর সময় বলেছিলাম "কলয়েড ডীপ কালার হয়। " ওভাবেই টেক্সট বইয়ে লেখা ছিল। ওরা ছিল ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র এম-২৫ ব্যাচ। এক বিচক্ষণ ছাত্র দাঁড়িয়ে জানতে চাইল "ডীপ পারপল না ডীপ পিঙ্ক কালার হয়? " আমি বিব্রত বোধ করলাম। বললাম "বইয়ে তো পারপল বা পিংক কিছু লেখা নেই। পরের ক্লাসে জেনে বলব। " ক্লাস শেসে রুমে এসে ঘেমে গেলাম। বাবারে, ভালভাবে আগে পরে না পড়ে ক্লাস নেয়া যাবে না।

ভালভাবে কয়েকদিন পড়াশুনা করে প্রস্তুতি নিয়ে টিউটোরিয়াল ক্লাস নেয়া শুরু করলাম। রবিনস-এর বই পড়ে নোট করে পড়াই। মনে হল ভালই পড়াই। কেমন টিচার হব, কার মত হব, এটা নিয়ে চিন্তা করি। একবার ভাবি প্রফেসর হাই ফকির স্যারের মত হই, আবার ভাবি প্রফেসর জলিল স্যারের মত হই। একজন গরম আরেকজন নরম। আরেকবার মনে হয় প্রফেসর আব্দুল হক স্যারের মত হই। আরেকবার মনে হয় প্রফেসর মান্নান সিকদার স্যারের মত অথবা প্রফেসর মোফাখখার স্যারের মত। শেসে স্থির করি কারও মত না। আমি আমার মত টিচার হব। তবে সব নাম করা টিচারদের ভাল ভাল গুন গুলি নিয়ে অন্য রকম এক টিচার।

বৃটিশ টীম আসবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চলছে। সাজ সাজ রব রব ভাব। বৃটিশ স্টাইলে ছাত্র শিক্ষক রেশিও তৈরি করে স্মল গ্রুপ লার্জ গ্রুপ ক্লাস নেয়া হচ্ছে। ক্লাসের ভিডিও ডকুমেন্টারি তৈর হচ্ছে। আমার ক্লাসেরও একটা ভিডিও ছিল। একদিন বৃটিশ টিম আসবেন। প্রফেসর লেভেল এর শিক্ষকগন প্রিন্সিপাল স্যারের রুমে বসে আছেন। কলেজের গেইট থেকে স্যারের রুম পর্যন্ত লাল গালিচা বিছানো হয়েছে। ডাঃ আনিস ভাইকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ইংরেজ গেস্টকে রিসিভ করতে। তাদের সাথে আসবেন বৃটেন প্রবাসী বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন এর সভাপতি প্রফেসর ডাঃ আকরাম সাইদ স্যার। আনিস ভাই আমাকে সাথে রাখলেন। আনিস ভাইকে রাখার কারন ছিল তিনি কথা বলার সময় বেশ কিছু কথা ইংরেজিতে বলতেন। আমি ইংরেজি বলায় তেমন ভাল ছিলাম না। যাহোক যা বলার আনিস ভাইই বলবেন। তারা আসতে দেরী করছেন। আমরা কলেজের সামনে পায়চারী করছি। হটাত দেখি সাদা চামড়ার দুইজন লোক জীপ থেকে নেমে কলেজ গেটের কাছে এসে গেছে। আনিস ভাই বলছেন "ওয়েলকাম, ওয়েলকাম, নাইচ টু মিট ইউ"।
তারা লাল গালিচার উপর দিয়ে হাটছেন। বলছেন "ডো ইউ এস্পেক্ট সাম ওয়ান টু কাম?" আনিস ভাই বলছেন "ইয়েস, উই এস্পেক্ট ইউ।" লাল গালিচার উপর দিয়ে হাটতে হাটতে তারা প্রিন্সিপাল স্যারের রুমের সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন "হয়ার ইজ প্রিন্সিপাল? " আনিস ভাই বললেন "হেয়ার ইজ প্রিন্সিপাল। " তারা ভিতরে প্রবেশ করলেন। আমরাও প্রবেশ কলাম। স্যারগন দাড়ায়ে গেলেন। তাদের

একজন বললেন "উই কেইম টু ভিজিট আওয়ার লেপ্রসি প্রজেক্ট ফ্রম ডেনিয়েম ফাউন্ডেশন , প্লিজ হেল্প আস।" এতক্ষনে স্যারগন বুঝে ফেলে বসে গেলেন। তাদেরকে বিদায় দিলেন। দরজা দিয়ে তারা দুইজন বেড় হয়ে গেলে দেখা গেল ভিতরে আরো তিন জন, আকরাম সাইদ স্যার সাথে। অর্থাৎ তাদেরকে কেউ রিসিভ করেন নি। আমরা তো ভিতরে এসেছিলাম। তারা ভিজিট করলেন। সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গিয়ে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ জেএমসি রিকগ্নাইজড করলেন। সেই থেকে এই মেডিকেল কলজের ডিগ্রি ইউকে-তে রিকগ্নাইজেড। প্রফেসর মোফাখখার স্যার ও প্রফেসর আকরাম সাইদ স্যারের অবদান। আমাদের সহযোগীতা।

আমার গ্রামের বাড়ী সখীপুর এলাকায়, দাদা-নানা বাড়ী কালিহাতি এলাকায়, শশুর বাড়ী ঘাটাইল এলাকায়, পড়াশুনা করেছি ভালুকা এলাকায়, শেসে আড়াই বছর চাকুরী করেছি নকলা এলাকায়। এসব এলাকার লোকজন জেনে গেছে আমি ময়মনসিংহ আছি। হাসপাতালে রুগী ভর্তি থালে অনেকেই আমাকে অনুরোধ করতেন রুগীটাকে একটু দেখে আসতে, একটু সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকে ভাল করে দেখার অনুরোধ করতে। আমি দেখতে যেতাম ও ভাল করে দেখার জন্য সি এ দেরকে অনুরোধ করতাম। দুই একজন ডাক্তার তাতে মাইন্ড করতেন। তাতে আমি কিছু মনে নিতাম না। আমার কর্তব্য আমি করেছি। তার কর্তব্য সে করেছে।

তখন হাসপাতাকের ডাইরেক্টর ছিলেন কর্নেল জহির স্যার। তিনি কর্মচারী ও ভিজিটরদের খুব ভাল ভাবে কন্ট্রোল করতে পারতেন। হাসপাতাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতেন। আমার এক পরিচিত হাই স্কুল শিক্ষক ঐ সময় হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। আমি তাকে দেখতে গেলাম। রুগী আমাকে একটি বড় সিরিঞ্জ দেখিয়ে বললেন "সিরিঞ্জটা যে ব্লক হয়ে গেল। "
-এত বড় সিরিঞ্জ দিয়ে কি করছেন?
-ডাবের পানি বের করতে চেষ্টা করছিলাম।
-ডাব কই?
-জগের ভিতর।
-এই রকম আস্ত ডাব জগের ভিতর কেন?
-কর্নেল সাব আস্ত ডাব গেট দিয়ে আনতে দেন না। তাই জগের ভিতর ঢুকিয়ে লুকিয়ে এনেছি। জগের ভিতরের আস্ত ডাব থেকে পানি বের করার জন্য সিরিঞ্জ এনেছি। সুই ঢুকানোর সময় ছোক্কা ঢুকে সিরিঞ্জ ব্লক হয়ে গিয়েছে।
-তা আপনাকে জগের ভিতরে আস্ত ডাব ঢুকানোর পরমর্শটা কে দিল?
-এই যে, এই আয়া বুদ্ধি দিয়েছে।
-এই তুমি ওনাদেরকে এমন আজব বুদ্ধি দিলে কেন?
-স্যার, আমি বলেছিলাম যেহেতু কর্নেল স্যার আস্ত ডাব আনতে দেন না সেহেতু বাইরে থেকে ডাব

কেটে পানি জগে ঢেলে নিয়ে ভিতরে আসতে। উনি না বুঝে আস্ত ডাব জগের ভিতরে পুরে এনেছেন। সিরিঞ্জ দিয়ে বের করার চেষ্টাটা ছিল দ্বিতীয় বোকামি।
--আপনি কোন সাব্জেক্ট ক্লাসে পড়ান?
-বিজ্ঞান।
-আপনার বুদ্ধিটা বড়ই বোকামির হয়ে গেছে। হায় রে কর্নেল ভয়!

আমার রুমটা মীর্জা হামিদুল হক স্যারের রুমের কাছা কাছি ছিল। মীর্জা স্যার অনেক স্লাইড দেখতেন। আমি তার পাসে গিয়ে বসতাম। মাঝে মাঝে তিনি ইন্টারেস্টিং স্লাইড আমাকে দেখাতেন, শেখাতেন। জামসেদ হায়দার সিদ্দিকী স্যারের পাসে গিয়েও বসতাম। তিনি স্লাইড দেখাতে ইচ্ছা করতেন না। কোন কিছু জিজ্ঞেস করলে বলতেন "এ বিসয়ে পড়ে আসেন। " আমি পড়ে আসলে তিনি বলতেন "কি পড়েছেন বলেন। " আমি বললে তিনি বুঝায়ে দিতেন। দুইজনের নিকট দুই ভাবে লাভবান হতাম। একজনের নিকট থেকে জ্ঞান আহোরন করতাম। আরেকজনের নিকট থেকে দক্ষতা। মীর্জা স্যার আমার সাথে তার পারিবারিক বিষয় নিয়েও আলাপ করতেন। আমিও আমার পারিবারিক বিষয় তার কাছে শেয়ার করতাম। একবার তিনি বললেন
-এভাবে আর কতদিন রিলাক্স করবেন? বিকেলে ল্যাবে প্রাক্টিস শুরু করে দিন। কলেজ প্যাথলজি থেকে কয়েকদিন কাজ শিখে নিলেই পারবেন। যেটা সমস্যা হবে সেটা আমি দেখে দেব। দুই বছর পর আপনাকে আবার উপজেলায় পাঠিয়ে দিবে। বাচতে হলে এরই মধ্যে পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্সে ঢুকতে হবে। এম ফিল পাস করলে আপনাকে কলেজেই রেখে দেয়া হবে। প্যাথলজিতেই এম ফিল করে ফেলুন। আগামী জুলাই সেসনেই ঢুকে পরুন।
-ধন্যবাদ, স্যার।আমি ক্লিনিক্যাল প্যাথলজি ল্যাবে ট্রেনিং নিয়ে কাজ শিখে নেব। আমি এম ফিল এডমিশন টেস্ট দেয়ার প্রস্তুতি নেব। এবার কোর্সে ঢুকা যাবে না। একটু সঞ্চয় করে নেই। আগামী বছর জুলাই মাসে ঢুকার চেষ্টা করব।

জামসেদ স্যারের একটি গুন ছিল। তিনি কোন জটিল কেইস পেলে হাসপাতাল বেডে রুগীর কাছে গিয়ে রোগের হিস্ট্রি নিতেন। আমিও ওনার সাথে যেতাম। হিস্ট্রি থেকে মিলিয়ে স্লাইড দেখতাম। তাতে ডায়াগনোসিস ক্লিয়ার কাট হত। একদিন তিনি একটি ব্লাডের স্লাইড দেখিয়ে ব্লাড ক্যান্সার সেল চিনালেন। বললেন
-এটা আমাদের কলেজের থার্ডইয়ারের একটি ছাত্রীর রক্তের স্লাইড।
মেয়েটিকে ডেকে আনা হল। আমি চিনে ফেললাম। সে সব সময় সামনের বেঞ্চের ডান পাশে বসত। মেধাবী ছাত্রী। আমি চিন্তিত হয়ে পরলাম তার পরিণতি ভেবে। স্যার জিজ্ঞেস করলেন
-তোমার শারীরিক কষ্ট কি?
-স্যার, কয়েকদিন হয় আমার ভিসন জ্বর। শরীর খুব দুর্বল। দাতের গোরা দিয়ে রক্ত আসে।

-আগামীকাল রিপোর্ট দিব।
স্যার ডিপার্টমেন্ট এর সকল প্রফেসরগনকে স্লাইড দেখালেন। সঠিক ডায়াগনোসিস -একুট মায়েলোব্লাস্টিক লিউকেমিয়া। পরেরদিন কলেজের ছাত্রদের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেল। জানতে পারলাম তার দুই তিন বছরের সিনিয়র ছাত্রকে সে ভাল বাসে। তাকেও আমি চিনি। সে আমাকে সাদেক ভাই বলে ডাকে। আমরা মিলে সহযোগীতা করে দেড় মাসের মধ্যেই তাকে জার্মানিতে বোন মেরো ট্রান্সপ্লান্টেশনের জন্য পাঠিয়ে দিলাম। জার্মান যাওয়ার আগে সেই ছেলের সাথে তার বিয়ে হয়। জার্মানিতেই চিকিৎসাধীন মেয়েটি ইন্তেকাল করে। মৃত্তুর আগে মেয়েটি তার স্বামীকে অনুরোধ করে যায় যেন তার স্বামী রক্ত রোগ বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হয় এবং মেয়েটির ক্লাস মেট বান্ধবী তারও নাম মেয়েটির নামে তাকে যেন বিয়ে করে। আমি খোজ নিয়ে দেখেছি ছেলেটি সেই বান্ধবীকেই বিয়ে করেছে এবং রক্ত বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হয়ে বেশ নাম করেছে। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যা পিঠে একটি ভাল পোস্টে আছে।

কিছুদিন পর আমি প্রাইভেট ল্যাবে একটি স্লাইড পেলাম, ঐ রকম। খোজ নিয়ে দেখলাম রুগী আমার এলাকার। তিনি আমার পরিচিত। একজন সরকারি কর্মকর্তা। আমি একদিন সময় নিয়ে জামসেদ স্যারকে দিয়ে কনফার্ম করিয়ে পরের দিন রিপোর্ট দিলাম। পিজিতে গিয়ে চিকিৎসা নেয়ার পরামর্শ দিলাম। আমি যখন পিজিতে পড়ি তখন তিনি ওখানে চিকিৎসাধীন ছিলেন। আমি ক্লাসের ফাকে তার কাছে যেতাম। তার কষ্ট দেখে খুব কষ্ট পেতাম। এখনো পাই। তাকে সব সময় নামাজরত পেতাম। তিনি বলতেন যতক্ষন বেচে আছি আল্লাহ্‌কে ডাকব। একদিন বিকেলে আমার ছাত্রীর স্বামী বললেন "সাদেক ভাই, রুগী মনে হয় আজ রাতে টিকবেন না। দেখে আইসেন। " ও তখন ওখানে অনারারী ট্রেইনিং নিত রক্ত বিদ্যায়। আমি ব্যাস্ততার জন্য রাতে যেতে পারি নি। পরেরদিন গিয়ে দেখি রুম খালি। বুকে একরাশ বেদনা নিয়ে ফিরে এলাম।

১৯৯৩ জুলাই সেসনে এডমিশন টেস্ট দিয়ে এম ফিল, প্যাথলজি চাঞ্চ পেয়ে দুই বছরের কোর্স করতে ঢাকায় আই পি জি এম আর এ বা পিজিতে চলে যাই।
===
ডাঃ সাদেকুল ইসলাম তালুকদার
১৬/৭/১৭